রামতারণ চাটুজ্যে, অথর

(গল্পগ্রন্থ – ক্ষণভঙ্গুর)

পনেরো-ষোলো বছর আগেকার কথা। পটলডাঙা স্ট্রীটে এক বেঞ্চিপাতা চায়ের দোকানে রামতারণবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ শুরু হয়। এক পয়সা দামের এক পেয়ালা চা, গোলদিঘি বেড়িয়ে এসে সস্তায় চা-পান সারতে দোকানটাতে ঢুকলাম। আমার দরের আরো পাঁচ-ছটি খরিদ্দার অত সকালেও সেখানে জমায়েত হত এক পয়সার এক পেয়ালা চা খেতে। এই দলের মধ্যে অনেকেই ১৫/২নং মেসবাড়ির অধিবাসী, একমাত্র রামতারণবাবুই ছিলেন গৃহস্থ লোক, যিনি ভাড়াটে বাড়িতে বাস করেন, মেসে নয়। সেইজন্যেই তাঁর সঙ্গে আলাপের প্রবৃত্তিটা আমার হয়তো অত বেশি ছিল। তখন থাকি মেসে, গৃহস্থবাড়ির মধ্যে একটা নতুন জগৎ দেখতাম।

রামতারণবাবুর সঙ্গে এই ধরনের দেখাশুনো প্রায় তিন চার মাস ধরে হল। অবিশ্যি চায়ের দোকানে যেমন আলাপ হওয়া সম্ভব তেমনি।—নমস্কার, এই যে, কেমন আছেন ?হেঁ হেঁ। আমার ওই এক রকম কেটে যাচ্ছে, আপনি ?হেঁ হেঁ, ওই এক রকম।

একদিন রামতারণবাবু বললেন—কোন্ দিকে যাবেন ?চলুন গোলদীঘিতে।

দুজনে একখানা বেঞ্চির ওপর এসে বসি। রামতারণবাবু একটা বিড়ি ধরালেন। তার পর বললেন—একটা কথা আজ শুনলাম, শুনে বড় খুশি হলাম, তাই আজ আপনাকে একটু আলাদা করে এখানে আনা। আপনি নাকি লেখক ?শুনলাম নাকি একখানা বই লিখেছেন, অনেকে ভালো বলছে ?

আমার সসঙ্কোচ বিনয়কে তিনি হাত-নাড়া দিয়ে হটিয়ে বললেন—বাঃ, এতে আর অত ইয়ের কারণ কি ! ভালোই তো। বেশ বেশ, বড় সন্তুষ্ট হওয়া গেল। সুরেন কাল আমায় বিকেলে বলছিল কিনা !

আমি চুপ করেই রইলাম। রামতারণবাবুর বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশি, মাথার চুল একটিও কাঁচা নেই, তাঁকে একটু সমীহ করেই চলতাম, বিড়ি সিগারেট চায়ের দোকানেও কখনো তাঁর সামনে খাইনি। রামতারণবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—বড় আনন্দ হল আপনার পরিচয় জেনে। শুনলাম নাকি আপনার বই বেশ বিক্রি-সিক্রি হয় ?

—ওই এক রকম। হয় মন্দ নয়।

—বটে !

রামতারণবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন—তবুও কি-রকম বিক্রি হয় ?একটা এডিশন ফুরিয়েছে ?

—আজ্ঞে এই সেকেন্ড এডিশন চলছে।

—কত দিনে হল ?

—ধরুন, তা প্রায় দেড় বছর।

—বটে ?

রামতারণবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না আমার বইয়ের সেকেন্ড এডিশন হওয়া এমন কি একটা সামাজিক দুর্ঘটনা !

আবার তিনি বললেন—আজকাল হয়েছে যত সব বাজে বইয়ের আদর—লোকের রুচিও গিয়েছে নেমে !

আমি মনে মনে ভীষণ রেগে গেলাম। আমি নতুন লিখতে আরম্ভ করিনি। পাঁচ সাত বছরের মধ্যে দুটো উপন্যাস ও অনেকগুলো ছোট গল্প লিখেছি। লোকে সেগুলো মন্দ বলেনি, উনি প্রবীণ ব্যক্তি, কোথায় আমায় উৎসাহ দেবেন, তা নয়, আমার বইকে বাজে বইয়ের পর্যায়ে ফেলে দিলেন এক নিশ্বাসে। কি করে জানলেন উনি ?পড়েছেন আমার বই ?লেখকের অভিমান একটু বেশি, আমি বেঞ্চি থেকে উঠে বসলাম—আচ্ছা, চলি। কাজ আছে।

—না না, বসুন। এই দেখুন, রেগে গেলেন। এই আপনাদের মতো ইয়ং লেখকদের বড্ড একটা ইয়ে। শুনুন, আমি বলছি কি, আপনি বোধ হয় জানেন না—আমিও একজন অথর।

'অথর'' কথাটা বেশ গালভরা করে সময় নিয়ে টেনে টেনে উচ্চারণ করলেন। 'অ—অ—থ—র'।

আমার বিরক্তি কেটে গেল এক মুহূর্তে। বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করি—ও ! আপনার কি কি বই—উপন্যাস না ধর্মগ্রন্থ ?

একটা সন্দেহ জেগেছিল মনে, বোধ হয় ধর্মগ্রন্থই হবে। কিন্তু আমায় আরো বিস্মিত করে দিয়ে উনি বললেন—উপন্যাস।

আমি বললাম—আপনার নাম তো রামতারণ—রামতারণ—

—চাটুজ্যে। নাম শোনা আছে ?আমার বই-এর নাম রঙের গোলাম, পরশমণি, সোনার বাংলা—

ও !

কোথাও নাম শুনেছি বলে মনে করতে পারলাম না। তবুও আপ্যায়ন ও হৃদ্যতার সুরে বললাম—বেশ বেশ। বড় খুশি হলাম। এতদিন ধরে চায়ের দোকানে মেলামেশা, কই একথা তো এতদিন শুনিনি—আজই প্রথম—

রামতারণবাবু বললেন—আরে আমিও তো আজ প্রথম—

সেই থেকে ওঁর সঙ্গে আলাপ ঘনিষ্ঠ হয়ে জমল। রোজ চায়ের দোকানে দেখা, প্রায়ই গোলদীঘির বেঞ্চিতে দুজনে নিভৃতালাপ। একদিন রামতারণবাবু বললেন—চলুন আমার বাড়ি একদিন। কবে যাবেন বলুন ?

এর দু-তিন দিন আগে থেকে রামতারণবাবু আমায় ধরেছেন, তাঁর একখানা বই আছে, বছর কয়েক আগে লিখেছেন, সেখানার জন্যে প্রকাশক জোগাড় করে দিতে হবে। বুঝলাম যে, বইখানা আমায় দেখাবার উদ্দেশ্যেই উনি বাড়িতে নিয়ে যেতে চান আমাকে। সেজন্যেই যেতে নারাজ ছিলাম, কি জানি কি রকম বই, প্রকাশক জোগাড় করে দিতে পারব কিনা, বাড়ি গিয়ে মাখামাখি করলে একটা চক্ষুলজ্জার মধ্যে পড়তে হবে। সুতরাং আমি কাজের অজুহাত দেখিয়ে কেবলই দিন পিছিয়ে দিই।

মাস দুই এভাবে কেটে গেল।

একদিন সকালে মেসে বসে আছি, রামতারণবাবু এসে হাজির। কখনো আসেননি, একটু খাতির করা গেল ভালোভাবেই। প্রবীণ সাহিত্যিক তো বটেই একজন।

আমায় বললেন—একটা বিশেষ কাজে এলাম ভায়া।

—বলুন।

—আপনাকে বলতে কোনো আপত্তি নেই। আমার একখানা বইয়ের সেকেন্ড এডিশন হবে, ফাস্ট এডিশনের বই একখানাও আর বাজারে নেই, খবর পেয়েছি। একটা প্রকাশক জোগাড় করে দিন। কিছু টাকার বড় দরকার হয়েছে।

বইখানা কি ?

রঙের গোলাম। আমার বইয়ের মধ্যে সব চেয়ে ভালো বই। বেশ নাম আছে বইখানার। বাজারে যাচাই করে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

—ও।

—দিতেই হবে ভায়া। একটু টানাটানি পড়েছে টাকাকড়ির। কিছু আসা দরকার, যেখান থেকেই হক। বুঝলেন ?

রামতারণবাবুর বাড়ি একদিন যেতেই হল। একতলায় দু-তিনটি ঘর। বাইরের ঘর নেই, তার বদলে ঢোকবার পথের অতি সংকীর্ণ স্থানটুকুতে একখানি বেঞ্চি পাতা। তাতেই বসলাম। রামতারণ একটা বাটিতে চিঁড়েভাজা নিয়ে এলেন, একটি ছোট ছেলে চা দিয়ে গেল। আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি হল না।

অত্যন্ত অনুরোধে পড়ে এসেছি। রামতারণবাবুর কোনো উপকার করতে পারব কি ?যদি পারি তো খুব আনন্দিত হব। সুতরাং কথাটা পেড়ে বললাম—তাহলে এবার—

—হ্যাঁ, এবার নিয়ে আসি।

একটু পরে খান-দুই মোটা পুরনো বাঁধানো খাতা এবং এক বোঝা কাগজ নিয়ে রামতারণবাবু আবার এসে বসলেন আমার কাছে। একখানা খাতা খুলে আমায় দেখাতে লাগলেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকায় তাঁর বই সম্বন্ধে যে সব সমালোচনা বার হয়েছিল, সেগুলোর কাটিং আঠা দিয়ে মারা। কাটিংগুলো হলদে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। বহুকাল আগের জিনিস, সে সব সাময়িক পত্রিকার মধ্যে একখানারও নাম আমি শুনিনি, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তাদের অস্তিত্ব ছিল, বহুকাল তারা মরে ভূত হয়ে গিয়েছে। তারা সকলে বলছে, রামতারণবাবু 'রংয়ের গোলাম'লিখে বঙ্কিমের খ্যাতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন, এমন ভাব ও ভাষা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ—এই ধরনের সব কথা। রামতারণবাবু সলজ্জ বিনয়ের সঙ্গে লাইনগুলো আমায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন। একখানা পত্রিকাতে লিখছে, "রামতারণ চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক (তখন 'কথাশিল্পী' শব্দটির সৃষ্টি হয়নি)। বাঙালি সমাজের নিখুঁত ছবি তাঁহার নিপুণ লেখনীর সাহায্যে এই উপন্যাসখানিতে ('রঙের গোলাম') ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।"—এই ধরনের আরো অনেক কিছু। সকলের অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, হংকং থেকে মুদ্রিত এক ইংরিজি খ্রিস্টানী কাগজে তাঁর বইখানার নাম প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। রামতারণবাবু নিতান্ত যা-তা লোক নন দেখছি। আমি নিজে লিখি বটে—কিন্তু কই, স্বদেশ ছাড়া বিদেশের কোনো কাগজে আজও পর্যন্ত আমার সম্বন্ধে একটা লাইনও বেরোয়নি। যত বড় তারা বলেছে রামতারণবাবুকে, অত বড়ও আমাকে আজও কেউ বলেনি।

কিন্তু এসব অতীত যুগের কাহিনী। আমি তখন নিতান্ত বালক, যখন রামতারণবাবু বঙ্কিমের কলম কেড়ে নিই-নিই করছিলেন; যদিও উক্ত ব্যক্তি সে দুর্ঘটনা ঘটার পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। কত যত্নে রামতারণবাবু খাতাখানা রেখে দিয়েছেন আজও ! কত কাল আগের সে সব কাগজ, যাদের নামও আজকাল কেউ জানে না। বিবর্ণ হলদে হয়ে গিয়েছে কাটিংগুলো। কত যত্নে কাটিংগুলোর ওপরে নিজের হাতে তারিখ লিখেছিলেন সেখানে, ১৯শে জানুয়ারি ১৯০২, ২রা মে ১৯০৫, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯০৪—।১৯৩৪ সালে বসে সেসব তারিখকে যেন বহু যুগ পূর্বের কথা বলে মনে হচ্ছিল আমার। আমি তখন ছেলেমানুষ, হয়তো তুঁততলায় রাখাল মাস্টারের পাঠশালায় পড়ি। কতকাল কেটে গিয়েছে তার পর, কত ঘটনা ঘটে গেল আমার জীবনে, তবে এসেছে ১৯৩৪ সাল আজ। আর উনি সেই সব দিনের নামজাদা লেখক।

তবে এমন হল কেন ?

এত যিনি নামজাদা লেখক এক সময়ের—আজ তিনি একখানা বই প্রকাশ করবার জন্যে আমার মতো লোকের শরণাপন্ন হয়েছেন কেন ?ত্রিশ বৎসর মধ্যে এমন গুরুতর পরিবর্তন কি ভাবে সম্ভব হল কি জানি।

রামতারণবাবু হাসিমুখে বললেন—দেখলেন সব ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হংকং টাইম্‌স্‌টার কাটিং দেখলেন ?

—আজ্ঞে দেখলাম। আপনার দেখছি আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল এক সময়ে।

—হেঁ হেঁ—তা—তা—

রামতারণবাবু সলজ্জ হাস্যে চুপ করলেন। আমি বললাম—কতদিন আপনি লেখেননি ?

—লিখব না কেন, লিখি। তবে মধ্যে দিনকতক বন্ধ করেছিলাম।

—কেন ?

—ইংরেজি কাগজের মোহে পড়েছিলাম।

—সে কি রকম ?

—একটা আমেরিকান পেপারে ভারতবর্ষের কথা লিখতাম। তারা বেশ টাকা দিত।

—তাতেই বাংলা লেখা ছাড়লেন ?

—পয়সা পাচ্ছি ভালো, আর বাংলা লিখে কি হবে, এই ভাবলাম।

—তার পর ?

—তার পর দেখলাম বাংলা না লিখলে মনের খুঁতখুঁতুনি যাচ্ছে না। কতকগুলো উপন্যাসের প্লটও মনে হল। আবার তখন বাংলা লিখতে হাত দিলাম। কিন্তু কি জানি কি হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে ! আর প্রকাশক পাচ্ছি নে মোটে। এদিকে সে আমেরিকান কাগজের সঙ্গেও আজকালআর সম্পর্ক নেই। তাহার হাত গুটিয়েছে, আগে বেশ টাকা দিত। কাগজ বোধ হয় তাদের উঠেই গিয়েছে। চিঠিও লেখে না আর।

—তাই তো !

রামতারণবাবু একটা বান্ডিল খুলে কতকগুলো পুরনো বই আমার সামনে ধরে বললেন—এই দেখুন আমার সব বই।

অনেক দিনের ছাপা, অনেকদিন আগের কাগজ। সেকালের ধরনের চটকদার বাঁধাই। সোনার জলে রুপোর জলে নাম লেখা। বইগুলোর বাঁধাই শুধু শক্ত কাগজের বোর্ডের। কি রকম ঘোরানো গড়নের অক্ষর। গ্রন্থকারের নামের পূর্বে লেখা আছে—অমুক অমুক বইয়ের লেখক শ্রীরামতারণ চট্টোপাধ্যায়।

একখানা বই হাতে দিয়ে রামতারণবাবু সগর্বে বললেন—এই আমার 'রঙের গোলাম'।

আগ্রহের সঙ্গে বইখানা হাতে নিলাম। বইখানার প্রথমদিকে এক সুদীর্ঘ ভূমিকা। 'শ্রীভুবনমোহন শর্মণঃ' নাম লেখা আছে ভূমিকার শেষে। আর ভূমিকায় লেখা আছে, 'আমি এই পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি, আমার সব ভালো লাগিয়াছে; আমার মনে হয়, আমি নিঃসঙ্কোচে লিখিতেছি, হিন্দুর পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্মের আদর যতদিন থাকিবে ততদিন সাধারণ্যে এই পুস্তকখানির আদর—'ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এতবার যিনি 'আমি' লিখেছেন ভূমিকায়, যাঁকে এত অনুরোধ করে ভূমিকা লেখানো হয়েছিল একদিন, আজ ত্রিশ বৎসর পরে তাঁকেও লোকে বেমালুম ভুলে গিয়েছে, আমার তো মনে হল না এ নাম কখনো শুনেছি।

রামতারণবাবু বললেন—ভূমিকাটা দেখছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভুবন বাঁড়ুজ্যের লেখা।

কথাটা বলেই রামতারণবাবু আমার মুখের দিকে চাইলেন, বোধ হয় লক্ষ্য করবার জন্যে এ নাম শুনে আমার মুখের ভালো কেমনতর হয়। কিন্তু আমার মুখের ভাবের উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি বলেই আমার ধারণা, তবুও গলায় যতদূর সম্ভব সম্ভ্রমের সুর এনে বললাম—তাই দেখছি।

রামতারণবাবু বললেন—আরো আছে বইয়ের পেছনে। উল্টে দেখুন। অনেক লোকের মতামত ছাপানো আছে।

আমি উল্টে দেখি, সত্যি অনেকে ভালো বলেছে বইখানাকে। ওদের মতামত ছেপে দেওয়া আছে বটে, কিন্তু যেসব লোকের মতামত ছাপানো হয়েছে, তখনকার দিনে তাদের ব্যক্তিত্ব হয়তো যথেষ্টই ছিল, তাদের মতামতের মূল্যও ছিল সেই অনুপাতে, আজকাল তাদের কেউ চেনে না, তাদের মতামতের মূল্য কানাকড়িও না। যুগ পরিবর্তন হয়েছে:সেদিনের বাণী যারা শুনিয়েছিল, আমড়া গাছের পাকা পাতার মতো তাদের দিন ঝরে গিয়েছে, তাদের আজ কেউ চেনে না।

তত্ত্বটা কি অদ্ভুতভাবেই উপলব্ধি করলাম সেদিন সেখানে বসে। আমার সামনে নোনাধরা পুরনো দেওয়াল, চুন-বালি খসে অনেকখানি করে ইট বেরিয়ে পড়েছে। একগাদা পুরনো বাঁধানো খাতা—জীর্ণ হল্‌দে বিবর্ণ খবরের কাগজের কাটিং-এ ছাপানো জীর্ণ হলদে বিবর্ণ প্রশংসা—যাদের মতামত, তারা ইহলোকের হিসেব চুকিয়ে ফেলেছে বহুকাল...পুরনো কাগজপত্রের ভ্যাপসা গন্ধ। প্রবীণ পক্ককেশ গ্রন্থকার রামতারণ চাটুজ্যে সামনে বসে শিরাবহুল হাতে পুরনো বই-খাতার পাতা ওল্টাচ্ছেন...

মন খারাপ না হয়ে পারে না। আমিও লেখক। আমার চেয়ে অনেক বড়দরের লেখক ছিলেন ইনি একদিন। দিন চলে যায়, থাকে না। এ যুগের বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের বইয়ের জীর্ণ পাতা ও-যুগে লাইব্রেরির আলমারির পেছনে তেলাপোকায় কাটে। ওজন-দরে বিক্রি হয়।

রামতারণবাবু বললেন—দেখেছেন ?এই দেখুন রায়বাহাদুরের মতো—

—কোন্ রায়বাহাদুর ?

—রায়বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ মুন্সী—কত বড় ইয়ে— কলকাতায় হেন সভা ছিল না যেখানে রায়বাহাদুর সভাপতিত্ব না করতেন—

—ও।

চিনলাম না। যেমন চিনিনি বইয়ের ভূমিকা-লেখক ভুবনমোহন বাঁড়ুজ্যেকে।

রামতারণবাবু এইবার 'রঙের গোলাম' সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন। কে পড়ে কবে কি বলেছিল ?কোন্ সভায় তাঁর সম্বন্ধে কি কি বলা হয় ? 'রঙের গোলাম' সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জিনিস বাংলা সাহিত্যে। ও ধরনের প্লট নিয়ে কেউ কখনো লেখেনি। আমাকে বললেন—নিশ্চয় আপনি পড়েছেন ?পড়েননি ?

পড়িনি একথা বলতে কষ্ট হল ওঁর সাগ্রহ প্রশ্নভরা দৃষ্টির সামনে। বললাম—নিশ্চয়ই।

এর পরেই তিনি তাঁর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দেখালেন। অনেকদিনের পাণ্ডুলিপি বলেই মনে হল। আমায় বললেন—শোনাব ?

একটু একটু করে পড়েন তিনি, আর আমি বসে বসে শুনি আর ঘাড় নাড়ি। মাঝে মাঝে বলেন, আপনার কেমন লাগছে ?বলি, ভালোই লাগছে। ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। ত্রিশ বছর আগের বাংলায় লেখা মামুলি প্লট বলে মনে হবারই কথা আমার কাছে। ওসব খোঁচ, ওসব কৌশল অনেক পেছনে ফেলে এসেছি আমরা। "পাঠক ! এই যুবক ও যুবতীকে কি চিনিতে পারিলেন ?ইহারাই আমাদের নবকুমার ও ইন্দুমতী।"

বেলা যায়-যায়। এতক্ষণে আমাদের আড্ডা বসেছে 'উদিত-ভানু' আপিসে—বন্ধুবান্ধব এসে গিয়েছে, চা চলছে। আমি উশখুশ করি আর ঘন ঘন বাইরের দিকে উঁকি মারি। রামতারণবাবুর সেদিকে দৃষ্টি নেই, তিনি তন্ময় হয়ে দরদের সুরে পড়ে চলেছেন 'ইন্দুমতী'র পাণ্ডুলিপি। ইন্দুমতী কি একটা ফ্যাসাদে পড়েছে, ভালো করে বোধ হয় জায়গাটা শুনিনি, এখন তার করুণ স্বগতোক্তি খুব দরদ দিয়ে উনি পড়ছেন। কি মুশকিলেই পড়া গেল, আজকের আড্ডা ফসকাল দেখছি ! হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলব—"আচ্ছা থাক, আমার কাজ আছে আজ—" ?

না, রামতারণবাবু কি মনে করবেন। তার চেয়ে শুনি বসে বসে। আর কখনো আসব না। সন্ধ্যা হয়ে এল ক্রমে। আর পড়া চলে না। রামতারণবাবু হেঁকে যেন কাকে বললেন, ওরে আলো একটা দিয়ে যা !

আমি এই সুযোগে বলি—তাহলে আজ—

—যাবেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু দরকার আছে।

—কাল আসবেন কোন্ সময় বলুন ?সবটা শুনতে হবে তো, নইলে প্রকাশকদের কাছে বলবেন কি ?কেমন লাগছে ?

—বাঃ চমৎকার !

—তাহলে কাল—ধরুন এই তিনটে—এখানে এসে চা খাবেন।

—ইয়ে—কাল ?কাল আবার ভবানীপুরে একটু কাজ ছিল—

—না না, তা হবে না ! একটা বই আরম্ভ করে মাঝে ফাঁক দিলে ইমপ্রেশন কেটে যায়—একটানা না শুনলে। আসুন কাল। সময় খুব কম হাতে।

অগত্যা রাজী হতে হল। পরদিনও গেলাম। সেদিন খাতা শেষ হয়ে গেল—আমার সৌভাগ্য বলেই সেটা ধরতে পারতাম যদি না রামতারণবাবু পড়ার শেষে খাতাখানা আমার ঘাড়ে চাপাতেন প্রকাশক খুঁজে দেওয়ার জন্যে।

বললেন—তাহলে এইবার একটু ভালো করে চেষ্টা করুন। শুনলেন তো সবটা ?এ ধরনেরবই আজকাল কেউ লিখতে পারবে না মশাই—নিজের মুখেই বলছি, তা আপনি যা-ই ভাবুন। অথর হলেই হল না।

আমার ভাবনা অবশ্য একটু ভিন্ন পথে গেল। এ যুগে চেষ্টা করলেও অমন বই লেখা যায় না ঠিকই। যুগের হাওয়া বদলেছে, রামতারণবাবুর যুগ পঁয়ত্রিশ বৎসর পিছিয়ে পড়ে গিয়েছে।

চেষ্টা করিনি তা নয়। সত্যিই চেষ্টা করেছিলাম। প্রকাশকেরা হেসেই কথাটা উড়িয়ে দেয়। সোজা কথা শুনিয়ে দেয় অনেকে, কেন আমি বৃথা চেষ্টা করছি, ও বই চলবে না। লেখকের নাম নেই বাজারে।

বললাম—কেন থাকবে না ?এক সময় তাঁর বইয়ের যথেষ্ট আদর ছিল !

—যখন ছিল তখন ছিল। এখন ও অচল।

রামতারণবাবুর সঙ্গে দেখা করতে সঙ্কোচ হয়। অন্য চায়ের দোকানে চা খাই, গোলদীঘির ত্রিসীমানা মাড়াই না। কিন্তু একদিন তিনি আমার মেসে এসে হাজির। আমি ওঁকে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেলাম।

উনি বললেন—কি ব্যাপার ?দেখি নে যে ?

—আসুন। শরীর খারাপ। বেরোইনি।

—বইখানার কতদূর কি হল বলুন তো। আমার ছোট নাতনীর অসুখ, কিছু টাকা বড় দরকার। কে কি বললে তাই বলুন।

বড় বিপদে পড়ি। কেউ কিছুই বলেনি যে, একথা তাঁকে শোনাতে আমার বড়ই বাধে। প্রবীণ লেখকের মনে সে রূঢ় আঘাত কেমন করে দিই ?অবশেষে বললাম—একজনদের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে।

—খাতা তারা নিয়ে নিয়েছে নাকি ?

—না—ইয়ে—খাতা আমার কাছেই—

রামতারণবাবু যেন দুর্ভাবনার দায় এড়িয়ে হাঁপ ছাড়লেন। প্রকাশকদের বিশ্বাস নেই, তারা অনেক সময় ভালো বই পেলে মেরে দেয়, আমি যেন খুব সাবধানে কাজ করি। অনেক সদুপদেশ দিলেন। আমি বেশ মন দিয়ে চেষ্টা করছি তো ?

দু' তিন জায়গায় ঘুরলাম আরো। রীতিমতো অনুনয়-বিনয় করলাম দু-এক জায়গায়।

তারা হেসে বলে—আপনি অমন করছেন কেন ওঁর জন্যে বলুন তো ?ওঁর বই চলবে না। আপনার নিজের বই আছে ?থাকে নিয়ে আসুন। কালই প্রেসে দিচ্ছি।

একজন অনভিজ্ঞ লোক বই ছাপবার ব্যবসা করতে এল মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে। আমার কাছে দিনকতক ঘোরাঘুরি করলে। পয়সা বেশি নেই, কম টাকায় কাজ হাসিল করতে চায়। তাকে পাঠিয়ে দিলাম রামতারণবাবুর কাছে। সে চেনে না বিশেষ কোনো গ্রন্থকারকে। আমার মুখে শুনলে রামতারণবাবুর খ্যাতির কথা। ওঁর বাসার ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ওঁর কাছে। সন্ধ্যার পরে লোকটা এল আমার বাসায়। খুব খুশি। মস্ত বড় 'অথার' ধরিয়ে দিয়েছি তাকে। আমার কাছে সে কৃতজ্ঞ থাকবে চিরকাল নাকি। অতবড় একজন লোক। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো খ্যাতি ছিল এক কালে ! ইংরেজি কাগজে পর্যন্ত নাম বেরিয়েছে, তাও এখানকার কাগজে নয়, চীন দেশের !

বুঝলাম রামতারণবাবু তার পুরনো খাতাপত্র সব বের করেছিলেন এর সামনে।

দিন পাঁচ-ছয় কেটে গেল। দুজনের কারো সঙ্গে দেখা হয় না। মনে মনে আশা হল, রামতারণবাবুর নৌকা ডাঙায় ভিড়েছে এতদিনে।

পরদিন আমি রামতারণবাবুর বাড়ি গেলাম। রামতারণবাবু স্নান করে উঠেছেন সবে, ভিজে গামছা পরেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, হাতে এক ড্যালা বড় কাপড়-কাচা সাবান। বললেন—কে ?ও, আপনি ?আমি বলি বুঝি সেই ভদ্রলোক—

—কে ?

—ঐ যাঁকে আপনি পাঠিয়েছিলেন। বেশ লোক।

—কি ঠিক হল ?

—বসুন। আমি কাপড় ছেড়ে এসে সব বলছি। চা দিতে বলি ?

—না, এতবেলায়—আসুন আপনি।

রামতারণবাবুর মনে খুব স্ফূর্তি। ফিরে এসে আমার কাছে বসলেন।

আমি বললাম—কি ব্যাপার বলুন।

—এখনই আসবেন উনি। আজ টাকা দেবার কথা।

—কথা পাকাপাকি হয়ে গেল ?কত টাকায় মিটল ?

—দেড়-শ টাকা।

দুজনেই বসে রইলাম অনেকক্ষণ। কেউ এল না। আমি উঠে বাড়ি চলে এলাম।

সেই প্রকাশকটি আমার কাছে দুপুরের পরেই এসে হাজির। বললাম—আপনি গেলেন না ওখানে ?কতক্ষণ বসে ছিলাম আমরা।

—না মশাই, ওঁর বই নেব না।

—কেন ?

—চলবে না, সবাই বারণ করছে। উনি সেকেলে লেখক—ওঁর বই একালে বিক্রি হবে না।

তবুও আমি অনেক বোঝালাম। ফল বিশেষ কিছু হল না। সেই যে চলে গেল, আর আমি তাকে কোনোদিন দেখিনি।

এই ঘটনার পরে দু'তিন মাস কেটে গেল। রামতারণবাবুর আর কোনো খবর পাইনি। সে চায়ের দোকানেও তিনি আর আসেন না।

তিন মাস পরে একদিন তাঁর বাড়ি গেলাম। ওঁর নাতি আমায় বললে—আসুন, দাদুর বড় অসুখ। উনি আপনার কথা প্রায়ই বলেন। চলুন ও-ঘরে।

সে ঘরে দিয়ে দেখি, রামতারণবাবু মলিন শয্যায় শুয়ে চোখ বুজে রয়েছেন। রোগীর মতো চেহারা নয় কিন্তু— বেশ সৌম্য মূর্তি, পাশে একখানা খবরের কাগজ—বোধ হয় কিছু আগে পড়ছিলেন। বিছানার পাশে একখানা বেঞ্চিতে ময়লা কাপড়ের ঘেরাটোপে পুরনো কয়েকটি বাক্স-তোরঙ্গ। দেওয়ালে ক্যালেন্ডার থেকে কাটা ছবি টাঙানো। কাঠের বাঁধাই সেকেলে আয়না একখানা।

বিছানার পাশে একটা টুলে রামতারণবাবু আমায় বসবার নির্দেশ করলেন।

বললাম—কেমন আছেন এখন ?

—ঐ অমনি। বুড়ো বয়সের জ্বর। শরীরটা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

দেখে সত্যিই কষ্ট হল। দারিদ্র্যের কালিমাখা হাতের ছাপ ঘরের আসবাবপত্রে, মলিন বিছানায়, ছারপোকার ছোপ ধরা-তক্তপোশে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বের একজন নামকরা লেখকের এই পরিণতি দেখে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব পুলকিত হয়ে উঠলুম না, বলাই বাহুল্য।

একথা-ওকথার পর রামতারণবাবু বললেন—আচ্ছা এক জুয়াচোরকে পাঠিয়েছিলেন মশাই ! এই বলে গেল টাকা নিয়ে আসছি, তার পর আর এলই না। ও আমাকে ভেবেছে কি ?আমার এখানে সেন লাইব্রেরির দোলগোবিন্দ সেন একদিন তিনশ' টাকা নিয়ে খোশামোদ করেছে একখানা ছোট উপন্যাসের জন্য—এই সাত-আট ফর্মা। ওর ভাগ্য ভালো যে দেড়-শ টাকায় ওকে বই দিতে রাজী হয়েছিলাম—তা বুঝল না ও—

রামতারণবাবুর ব্যথা কোথায় জানতে দেরি হয় না। আমি কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম।

উনি বললেন—আপনার সঙ্গেও দেখা করেনি ?

অম্লান বদনে বললাম—কই, না !

—হামবাগ কোথাকার ! ওর কোনো পুরুষে প্রকাশক নয়। মুড়িমিছরির যে একদর করে সে আবার প্রকাশক ! অনেক পাবলিশার দেখেছি আমি, বুঝলেন ?আমার এখানে ধন্না দিয়েছে, বুঝলেন ?

—নিশ্চয়ই। তা হবে না ?কত বড় নাম আপনার !

রামতারণবাবু আত্মপ্রসাদের প্রসন্ন হাসি হাসলেন। বললেন—সে আপনারা বুঝবেন মশাই, কারণ আপনারা লেখেন নিজেরা। ভালো হোক মন্দ হোক, লেখেন তো ?আমার 'রঙের গোলাম' বইখানা পড়েছেন, দেখেছেন তো ?ওর নাম চিরকাল থেকে যাবে—কি বলেন আপনি ?

—তা আর বলতে ! সেদিন এক বড়লোকের বাড়ি গিয়েছি—সেখানে আপনার 'রঙের' গোলাম-এর কথা উঠল—

রামতারণবাবু আগ্রহের মাথায় বিছানা ছেড়ে সোজা হয়ে বসে বললেন ব্যগ্রভাবে—কোথায় ?কোথায় ?

—ওই—ইয়ে, বালিগঞ্জে।

—তার পর ?তার পর ?

—তার পর ওরা বললে, বইয়ের মতো বই একখানা। খুব ভালো বলছিল সবাই।

—বলতেই হবে যে মশাই, বলতেই হবে। এমন কৌশল করে রেখেছি ওর মধ্যে যে, সব ব্যাটাকে ভালো বলতে হবে। কেঁদে ভাসিয়ে দিতে হবে শেষের দিকে—কেমন, না ?

—উঃ, সে আর—

ভগবান যেন আমায় ক্ষমা করেন। রামতারণবাবুকে দেখে মনে হচ্ছিল, তাঁর রোগ অর্ধেক সেরে গিয়েছে। নিজের বইয়ের প্রশংসা শোনা অনেকদিন বোধ হয় তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি।

সেদিন একটু পরেই চলে এলাম।

এইদিনটি থেকে কি জানি কি হল, যখনই রামতারণবাবুর কাছে গিয়েছি, তখনই মাঝে মাঝে তিনি জানতে চাইতেন, তার 'রঙের গোলাম' সম্বন্ধে আর কোথাও কিছু শুনলাম কিনা। কি আগ্রহেই জিজ্ঞেস করতেন কথাটা !

আমায় সংবাদ দিতেই হত। কখনো তার বইয়ের প্রশংসা শুনে এলাম বালিগঞ্জের কোনো ক্লাবে, কোনোদিন ট্রেনে, কোনোদিন তরুণ সাহিত্যিকদের আড্ডায় কোনোদিন বা আমার কোনো বান্ধবীর মুখে।

এর পরেই তাঁর সানুনয় অনুরোধ শুনতে হত প্রায় প্রত্যেকবার—দেখুন না মশাই, বইখানার সেকেন্ড এডিশন যদি কেউ নেয়। একবার উঠে-পড়ে লাগতে হয় এবার। আপনি তো পড়েছেন, আপনি বলবেন তাদের বুঝিয়ে— কি বলেন ?

ভগবান জানেন, 'রঙের গোলাম' নামধেয় কোনো উপন্যাস আমি চক্ষে দেখিনি।

হয়তো রামতারণবাবুর বাসাতে যাতায়াত করা উচিত ছিল না অত, কিন্তু না গিয়ে আমি পারতাম না। কেমন একটা টান অনুভব করতাম। প্রবীণ লেখক অসহায়ভাবে রোগশয্যায় পড়ে আছেন। কখনো দু-পাঁচটা কমলালেবু, কখনো একটু মিছরি হাতে নিয়ে যেতাম—কিন্তু রামতারণবাবু সব চেয়ে খুশি হতেন ভালো গুড়ক তামাক নিয়ে গেলে। বৈঠকখানা বাজারের সাধনের দোকানের তামাক বড় পছন্দ করতেন।

এর পরে ধীরে ধীরে রামতারণবাবুর কাছে যাওয়া আমার কমে গেল।

এমনিই হয়ে থাকে জীবনে। কিছু সময় ধরে এক এক লোকের রাজত্বকাল চলে, সে সময় পার হয়ে গেলে সারা জীবনেও আর হয়তো সে লোকের দেখা মেলে না। দেখা মিললেও প্রথম আলাপের দিনের উৎসাহ খুঁজে পাওয়া যায় না। রামতারণবাবুকে সে চায়ের দোকানে আর অনেকদিন দেখিনি।

দশ-এগারো বছর কেটে গেল এর মধ্যে।

আমার নিজের জীবনেও কত পরিবর্তন ঘটে গেল। কলকাতার অধিবাসী এখন আর আমি নই। গ্রামদেশে বাড়ি করেছি, মাঝে মাঝে আসি যাই, এই পর্যন্ত।

একদিন হেদোর ধারের বেঞ্চিতে বসে একটু জিরোচ্ছি, পাশেই একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বসে ছিলেন আমার আগে থেকেই। দু-একবার চেয়ে দেখে লোকটিকে চিনতে পেরে আমি একেবারেবেঞ্চি ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। বললাম—রামতারণবাবু যে ! চিনতে পারেন ?

রামতারণবাবু খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছেন—চেহারাও গিয়েছে অনেক বদলে। আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—ও, আপনি ?

আবার ওঁর পাশে বসে পড়ি। এত দিনের অদেখা, অনেক কথাবার্তা হয়।

উঠবার সময় বললেন—চলুন না আমার বাসায়। সেই ভীম ঘোষের লেনেই আছে বাসা। ওখানেই বহু কাল কাটল। এখন আর কোথায় বা যাব ?আপনি তো ভুলেই গিয়েছেন একেবারে !

গেলাম সেই পুরনো বাড়িতে। সেই পুরনো দিনের আসবাবপত্র ঠিকই আছে, মায় ঢুকবার দরজার সামনে সেই বেঞ্চিখানা পর্যন্ত। পরিবর্তনের মধ্যে রামতারণবাবু একটু স্থবির হয়ে পড়েছেন, নিজেও তুললেন সে কথা।

—আর তেমন হাঁটাহাঁটি করতে পারি নে। হেদোটাতে গিয়ে বসি বিকালটাতে। যাবই বা কোথায়, গেলে পয়সা খরচ। যা টানাটানির সংসার—

—আপনার বড় ছেলে কোথায় কাজ করছে ?

—সে তো নেই। আজ এই আট বছর। ওই ছোট ছেলেটা কি একটা চাকরি করে, রেশন পায়, তাতেই কোনোরকমে—

—কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। কি কথা বলি ?

রামতারণবাবুই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে উঠলেন—ভালো কথা—

আমি ওঁর মুখের দিকে চাইলাম।

—আমার 'রঙের গোলাম'-এর কথা আজকাল কেমন শোনেন-টোনেন ?লোকে বলছে কি ?আধুনিক জেনারেশনের মত কি ?ওরা ওটা বুঝতে পারবে ?ওদের জন্যেই ওটা লেখা। আমরা হচ্ছি অ-অ-থর, বইয়ের কথা লোকে কি বলে না বলে—সে তো আর আপনাকে বোঝাতে হবেনা—আপনিও তো একজন—

শীর্ণকায় অতিবৃদ্ধ ঔপন্যাসিক আমার সামনে; মিথ্যা গল্প ফাঁদি, বলি—হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল, সেদিন ট্রামে দেখি আপনার বই নিয়ে দুই ভদ্রলোকের মধ্যে বেধেছে ঘোর তর্ক—কলেজের ছেলে বলেই মনে হল, দুজনেই ভক্ত আপনার লেখার—তার পর—

উনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—হতেই হবে যে—ওর মধ্যেই এমন কৌশল করা আছে, কেঁদে ভাসিয়ে দিতে হবে শেষের দিকে যে ! তা ভালো কথা, ওর সেকেন্ড এডিশনটার জন্যে একটু খাটতে হচ্ছে আপনাকে, বুঝলেন ?আপনাকে বলব না তো কাকে বলব বলুন—অথরস্য অথরোগতি—নাম করা বই বাজারের। তাহলে একটু দয়া করে—

শীর্ণ হাত দুখানা দিয়ে রামতারণবাবু সাগ্রহে আমার ডান হাত চেপে ধরলেন।